প্রথম আলো

কলাম

মতামত

অভ্যুত্থানের পর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কেন ব্রাত্য

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ঝাঁপিয়ে না পড়লে অভ্যুত্থান আদৌ সফল হতো কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে। সেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই কেন ব্রাত্য, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন **সৌমিত জয়দ্বীপ**

সৌমিত জয়দ্বীপ

প্রকাশ: ০১ আগস্ট ২০২৫, ১৩: ০১

গত বছরের ১৭ জুলাই ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ-সমাবেশে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জ করে

ছবি: সুমন ইউসুফ

বাংলাদেশ হলো আত্মমুগ্ধ ব্যক্তিদের (নার্সিসিস্টদের) দেশ। এ জনপদের মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতার মধ্যে তাই ‘নার্সিসিস্ট পারসোনালিটি ডিজঅর্ডার’ (এনপিডি) থাকাটা অসম্ভব কিছু নয়। মনোবিজ্ঞানীরা অবশ্য একাডেমিকভাবে এ প্রবণতার ব্যাপারে ভালো বলতে পারবেন। তবে জুলাই অভ্যুত্থানকে মানদণ্ড ধরলে এ মুহূর্তে বাংলাদেশকে ‘নার্সিসিস্টদের দেশ’ বললে অত্যুক্তি হবে না!

জুলাই অভ্যুত্থানকে নানা রঙে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। জাতিগতভাবে এটিও সম্ভবত আমাদের সাধারণ প্রবণতা। যে কারণে এই গণ-অভ্যুত্থানকে কখনো ‘দ্বিতীয় স্বাধীনতা’, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ‘বিপ্লব’, কখনোবা ‘মেটিকিউলাস ডিজাইন’ কিংবা ‘মাস্টারমাইন্ড তত্ত্ব’ দিয়ে আবরণ পরানো হয়েছে। এটা হয়েছে নিজেকে অধিপতিশীল ভাবার কারণে কিংবা নিজের সময়কে বৃহৎ ইতিহাসের নিক্তিতে অনেক বড় করে দেখার আরোপিত ভ্রান্তি থেকে।

একটা গণ-অভ্যুত্থান যে ‘মেটিকিউলাস’ কিংবা একক ভরকেন্দ্রিক হতে পারে না এবং সর্বোপরি গণ-অভ্যুত্থানকে অর্গানিক উপায়ে বিপ্লবে রূপান্তর করতে যে ‘উৎপাদন পদ্ধতি’ (মোড অব প্রোডাকশন) ও ‘উৎপাদন সম্পর্ক’ (রিলেশনস অব প্রোডাকশন) পরিবর্তন অনিবার্য, এটা ক্রিটিক্যালি পাঠ না করেই গণ-অভ্যুত্থানে আপামর শ্রেণির অবদানকে খাটো করে দেখেছেন হালের অধিপতিশীলরা।

আমি যা করেছি, সেটিই মহীয়ান, বাদ বাকি সব ‘অপর’—এই প্রবণতা থেকেই জন্ম হয় ফ্যাসিবাদের; আধিপত্যবাদী বয়ানের। এই মননের অন্তরেই ঘুমিয়ে থাকে নার্সিজম; অর্থাৎ নার্সিজম খোদ নিজেই এমন একটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভরকেন্দ্র সৃষ্টিকারী, যা অধিকতর সংকটের মুখোমুখি করে ফেলে সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতিকে।

অভ্যুত্থান-উত্তর প্রথমবর্ষের মধ্যেই তার দিক উন্মোচন হতে শুরু করেছে, যা অভ্যুত্থানের প্রকৃত স্পিরিটকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক-গোষ্ঠীকেন্দ্রিক বয়ান ও ক্ষমতাচর্চা তো জুলাইয়ের স্পিরিট নয়!

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্যাম্পাসকেন্দ্রিক নড়াচড়ায় যখন কোনো কিছুই টলানো যাচ্ছিল না, তখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীদের মহাসড়ক দখলের প্রত্যাঘাত, জীবনবাজি রাখা, শহীদ হওয়া ছিল ঐতিহাসিক ও অভূতপূর্ব বড় ঘটনা।

অতীতের নিক্তিতে চব্বিশের ঐতিহাসিক অবস্থান

চব্বিশের গুরুত্ব-বীরত্ব নিঃসন্দেহে নানামাত্রিকভাবে অভূতপূর্ব। তবে এই বীরত্বকে সাতচল্লিশ ও একাত্তরের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা হিসেবে দেখার নিক্তিটিও ‘অভূতপূর্বভাবে’ বিপজ্জনক! এই বয়ান কয়েকটি দুর্দান্ত ঐতিহাসিক লড়াইকে একবারে নাকচ করে দিয়েছে। তার মধ্যে উনসত্তর ও নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থান অন্যতম।

আশির দশকে প্রায় দশকব্যাপী আন্দোলনে ছাত্রসংগঠনগুলো একত্র হয়ে ১০ দফা দিয়েছিল। সেসব দাবির মধ্যে রাষ্ট্রব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা ও সর্বোপরি শ্রেণিবৈষম্য দূরীকরণে উৎপাদন সম্পর্ক বদলের তৎপরতা ছিল। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ছয় ছফাকে বিস্তৃত করে ছাত্রসমাজের যে ১১ দফার ওপর দাঁড়িয়েছিল, তার কাছাকাছি দূরদর্শী রাজনৈতিক এজেন্ডা এর আগে-পরে বলতে গেলে তৈরিই হয়নি।

নতুন রাষ্ট্রপ্রকল্পের স্বপ্নে বিভোর শিক্ষার্থীদের আটষট্টি-উনসত্তরের ১১ দফার মধ্যে তিন-চতুর্থাংশ দাবি ছিল শ্রমজীবী শ্রেণির প্রশ্নে, যেগুলো উৎপাদন সম্পর্ক পরিবর্তন ও সামাজিক বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরেছিল। আর প্রথম দফাতেই ছিল শিক্ষার আশু সংস্কারকল্পে হামুদুর রাহমান শিক্ষা কমিশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব বিশ্ববিদ্যালয় আইন বাতিল ও শিক্ষার্থীদের মাসিক ফি কমানোর দাবি। আশ্চর্যই বৈকি, বর্তমানের শক্তিশালীদের বয়ানে উনসত্তর নিয়ে কোনো কথাই নেই!

এরও আগে দুর্দান্ত দূরদর্শী ছিল যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনকেন্দ্রিক ২১ দফা, যার প্রথম আটটির মধ্যে সাতটিই ছিল কোনো না কোনোভাবে কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষের অধিকার রক্ষার্থে। ৯ থেকে ১১ পর্যন্ত তিনটি দফা ছিল শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার সংস্কার প্রশ্নে।

পূর্ববঙ্গে মুসলিম লীগের নিপীড়নমূলক স্বেচ্ছাচারী শাসনের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের ওই ২১ দফা হয়ে উঠেছিল সত্যিকার অর্থেই জনগণের জন্য মুক্তির মেনিফেস্টো। তবে সেটা ছিল রাজনীতিকদের ভূমিকায় ঋদ্ধ আর আমাদের এই আলোচনা শিক্ষার্থীদের ভূমিকা বিচারে সীমাবদ্ধ।

চব্বিশের '৯ দফা' কি মনে থাকবে

সময়ের জীবিত সন্তান হিসেবে নিজেদের সময়কে আমরা যতই বীরত্ববাচক বলি না কেন, চব্বিশের ৯ দফা পূর্ববর্তী সময়গুলোর দাবি-দফার তুলনায় বরং অনেক বিবর্ণ-ম্রিয়মাণ। এগুলো দিয়ে অতীতের ধারাবাহিকতাকেও স্পর্শ করা যায় না, আবার ভবিষ্যতের রাজনৈতিক গতিপথও নির্ধারণ করা যায় না। তা ছাড়া একাত্তরের পর সবচেয়ে বৃহদাকার হত্যাকাণ্ড ও জুলুমের পর 'প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমা চাওয়া'র মতো নিরীহ দাবি যেখানে সর্বাগ্রে অলংকৃত হয়, সেই দাবিনামা আন্দোলনের নেতারা স্বভাবতই ভুলে যেতে চাইবেন, এ আর আশ্চর্য কী!

বস্তুত, চব্বিশের যে ৯ দফা, তার কটিই-বা মনে রেখেছেন খোদ নেতারা কিংবা সাধারণ মানুষ? এগুলো কি নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা কিংবা রাজনৈতিক বন্দোবস্তের দিশা দিতে পারে? অনিবার্যভাবেই না।

এই ৯ দফার প্রতিটিই ইস্যুভিত্তিক ও চব্বিশের আন্দোলনকেন্দ্রিক। ভবিষ্যতের রাষ্ট্র ও রাজনীতি পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা এই দাবিগুলোতে স্থান পাওয়ার যোগ্যই বিবেচিত হয়নি; কিংবা দাবিদাওয়ার প্রণেতারা সম্ভবত অতীতের ছাত্রনেতাদের মতো দূরদৃষ্টি দিয়ে ভাবেনইনি বিষয়গুলো।

চব্বিশের ‘ব্রাত্যকরণ প্রকল্প’

চব্বিশের জুলাইয়ের ‘৩৬ দিন’ ছিল বিপুল সম্ভাবনা ও অসামান্য বীরত্বময়। জুলুমের অপর পৃষ্ঠে একটা অসাধারণ সম্ভাবনাময় সময়ের জন্ম দিয়েছিল চব্বিশের জুলাই। কিন্তু সালতামামিতেই প্রশ্নটা আসবে, সেই সম্ভাবনাকে কি রক্ষা করা গেল? দঙ্গলবাজি ও মবতন্ত্রের বাড়বাড়ন্ত কি গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে প্রতারণা করেনি?

নানা শ্রেণি-পেশা, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের বিপুল প্রান্তিক মানুষ কীভাবে শুধু সংখ্যাগুরু ও ক্ষমতাবানের অহমিকার বলি হয়ে গেল অভ্যুত্থানের পর, সেই প্রশ্নের জবাব তো সরকার ও অভ্যুত্থানের নেতৃত্বকে দিতে হবে। অভ্যুত্থানের এক বছর হয়ে গেলেও ন্যূনতম কোনো ভাবনা-ভাবনান্তর প্রান্তজনদের জন্য বরাদ্দ নেই। উল্টো জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং নারীরা অভ্যুত্থানের পর আরও কোণঠাসা হয়েছেন।

সত্যের খাতিরে স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে শিক্ষাব্যবস্থার ভয়ংকর দার্শনিক সমস্যা থেকে উদ্ভূত রাষ্ট্রীয় কর্মসংস্থানব্যবস্থা সংস্কারের আন্দোলনটির দর্শনগত সীমা খুবই সংকুচিত। যে কারণে দাবিদাওয়ায় নেই কৃষক-শ্রমিকের কথা; অথচ সরকারি গেজেটভুক্ত ৮৪৪ জনের মধ্যে সর্বোচ্চ ২৮৪ জন সাধারণ শ্রমজীবী ও ১২০ জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন (দৈনিক *প্রথম আলো*, ২০ জুলাই, ২০২৫)।

এই যে সমাজের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বর্গকে অপর ও ব্রাত্য করার প্রকল্প, তাদের ভূমিকার স্বীকৃতি লোপাট করা, এগুলো কি বৈষম্যবিরোধী অবস্থান?

আরও নেই শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তনের কোনো রূপরেখা; কথা নেই অভূতপূর্ব সাড়া দেওয়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, অধিভুক্ত কলেজ ও অপরাপর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর—যাদের শহীদের সংখ্যা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি। বিশেষত, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ঝাঁপিয়ে না পড়লে অভ্যুত্থান আদৌ সফল হতো কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে। অথচ সেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই আজ ব্রাত্য!

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক ভূমিকা

ঐতিহাসিকভাবেই বাংলাদেশে বড়দের পাঠশালায় ‘কোমলমতি’ ভাবা হয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের। নামের সংক্ষিপ্ত রূপটিও (বেবি) কী আশ্চর্যজনক আক্ষরিক সার্থকতায় ভাস্বর! অবস্থাপন্নদের সন্তান, রাজনীতি-সমাজবিমুখ, দেশ নিয়ে ভাবনাহীন, বিদেশে এক পা দেওয়া, সারাক্ষণ শুধু সিজি সিজি (সিজিপিএ) জপা, পশ-জোস-বস করপোরেট কালচার সিনড্রোম, ফাস্ট ফুড, আপেল ও ব্রয়লার খাওয়া এবং সর্বোপরি, ‘আই হেট পলিটিকস’—কোমলমতি, তথা বেবি অভিধা দেওয়ার জন্য এর চেয়ে বেশি আর কী প্রয়োজন! বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এভাবে দেখার প্রবণতা ‘প্রাচীন প্রস্তর যুগ’ থেকেই চলে আসছে। অথচ তাঁরাই আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন!

আন্দোলনের একপর্যায়ে গত বছরের ১৬ জুলাই রাতে ইউজিসি একযোগে সব পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ এবং শিক্ষার্থীদের আবাসিক হল ছাড়ার এখতিয়ার-বহির্ভূত আদেশ দেয়। পরদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে নিপীড়নবিরোধী শিক্ষক সমাবেশ থেকে ছাত্র হত্যাকাণ্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের আদেশের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক, যেখানে বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু শিক্ষক অংশ নেন। শিক্ষকদের এই প্রতিবাদী অবস্থান বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক পরোক্ষ দাবানলের সৃষ্টি করে।

হল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ১৮ জুলাই, যে সময় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশির ভাগ শিক্ষার্থী উপায়ন্তর না পেয়ে শহর ছেড়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় রাষ্ট্র ও সরকারকে প্রত্যাঘাত করেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। বিশেষত ঢাকার রামপুরা থেকে উত্তরা পর্যন্ত পুরো প্রগতি সরণি ও কুড়িল বিশ্বরোড রণক্ষেত্রে পরিণত হয়।

রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিল। ২ আগস্ট শুক্রবার, ২০২৪
ছবি: প্রথম আলো

যেহেতু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্যাম্পাসে স্থানাভাবে রাজপথের ধারণা অনেক সংকুচিত, সেহেতু শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদের মঞ্চ হয়ে ওঠে মহাসড়ক। আন্দোলনকে মহাসড়কে আনতে পারেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা—এই ধারণাই তখন ক্ষমতাসীন রেজিমের ছিল না। সেই অর্থে, মহাসড়ক দখল করে সারা দেশকে ক্ষমতাকেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার প্রথম কৃতিত্ব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্যাম্পাসকেন্দ্রিক নড়াচড়ায় যখন কোনো কিছুই টলানো যাচ্ছিল না, তখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থীদের মহাসড়ক দখলের প্রত্যাঘাত, জীবনবাজি রাখা, শহীদ হওয়া ছিল ঐতিহাসিক ও অভূতপূর্ব বড় ঘটনা।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় জুলাইয়ে এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত ইতিহাসের সব মিথ ভেঙে দিয়েছিল। ধসিয়ে দিয়েছিল পাবলিক-প্রাইভেট শ্রেণিভেদের বাইনারি। গুঁড়িয়ে দিয়েছিল বিগত সব অবজ্ঞার ভাষা।

গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে ১৮ জুলাইকে তাই যথার্থই ‘প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিরোধ দিবস’ ঘোষণা দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। কিন্তু সেই দিবস পালনে অভ্যুত্থান-উত্তর সুবিধাভোগীদের কোনো দায়িত্ববোধের অনুভূতি হয়নি!

একেই কি বলে অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্র

কোনো বস্তুগত আকাঙ্ক্ষা থেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে যোগ দেননি। সরকারি চাকরির প্রতি তাঁদের মোহ কম আর রাষ্ট্রীয় চাকরিনীতির সংস্কৃতিও তাঁদের প্রতি সদয় নয়। তাঁদের গন্তব্য হয় তাই বিদেশ, লক্ষ্য বড়জোর একটা ভালো আইএলটিএস স্কোর। মানে, তাঁরা স্বভাবজাত ‘আইএলটিএসপন্থী’। সেই তাঁরাই ‘বিসিএসপন্থী’ শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ালেন মূলত একটা ‘ফেলো-ফিলিংস’ থেকে। সঙ্গে শিক্ষকেরাও লড়লেন।

বিস্ময়করভাবে দেখা গেল, অভ্যুত্থানোত্তর সরকার ১০ শতাংশ ট্যাক্স বসিয়েছে তাদের প্রতিষ্ঠানের ওপর; আগের ‘নো ভ্যাট’ আন্দোলনের অভিজ্ঞতা বলে, যেটা শিক্ষার্থীদেরই দিতে হবে। অথচ রাষ্ট্রের প্রতি প্রভূত অবদানস্বরূপ নয়া বন্দোবস্তে উল্টো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সরকারি ছাত্রাবাসের সুবিধা দেওয়া উচিত ছিল।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা হয়রানি, বহিষ্কার ও পুলিশি হামলার শিকার হয়েছেন। কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার দায়ে শিক্ষকেরা চাকরিচ্যুত হয়েছেন। বেতন-ফি বেড়েছে কোথাও কোথাও। আন্দোলনের অংশীদারত্ব দখলের চেষ্টাও হয়েছে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সরকারে গেছেন, নানা সংস্কার কমিশনে গেছেন; কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল অংশীজনের কথা কেউ মনেও রাখেননি। এমনকি খোদ ইউজিসিতেও নেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো প্রতিনিধি! মানে, ৫৫ বছরের বৈষম্যের ধারা চলমান রয়েছে।

এ-ই তাহলে বৈষম্যহীন অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্রের চরিত্র? এমন মহাকায় অভ্যুত্থানের পরও চলতে থাকবে নার্সিসিস্ট গোষ্ঠীর কর্তৃত্ব আর বাকিরা হবেন ব্রাত্যকরণের শিকার?

- **ড. সৌমিত জয়দ্বীপ** সহকারী অধ্যাপক, স্কুল অব জেনারেল এডুকেশন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

মতামত লেখকের নিজস্ব

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান

স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৫ প্রথম আলো